evo‡Q `e¨gj¨, dU‡Q †M‡bW-†evgv, Pj‡Q nZ¨v, mš¿vm Ges niZvj... msjvc ev msm‡` bq - Pj‡Q

ivRc‡_ hy×

wj‡L‡Qb Rqš— AvPvh

মরুদ্যানের উটপাখি। সে যখন কিছুই দেখতে চায় না তখন বালুর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে রাখে। ভাবে সব কিছু ঠিকমত চলছে। সে যা করছে তাও কেউ দেখছে না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের হয়েছে এমনি অবস্থা। তারা জনগণকে দেখতে চায় না। জনগণের দুঃখ দুর্দশা বুঝতে চায় না। তারা ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের কথা ভুলে যায়। নিজেকে জনগণ থেকে দূরে রাখে। নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে মরিয়া হয়ে ওঠে। বিরোধী দলে থাকলে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। লাগাতার হরতাল দেয়, চলে জ্বালাও পোড়াও। যে কোনো প্রকারে ক্ষমতায় যেতে চায়। এমনি রুগ্ন, অসুস্থ, জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতি দেশকে আজ গভীর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। মোটা চালের কেজি ২০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ছে। ফুটছে গ্রেনেড, বোমা। আহত, নিহত হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাধারণ মানুষ। বাড়িতে ঢুকে হত্যা করা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। আর বিরোধী দল বিভিন্ন ইস্যুতে শুধু হরতাল ডাকছে। জনমনে শ্বাসরুদ্ধকর এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

উগ্র মৌলবাদী শক্তির উত্থান, সরকারের দমননীতি, দুর্নীতি, জনগণ সরকারের প্রতি দারুণভাবে অসন্তুষ্ট। অথচ তাদের ভরসা বিরোধী দলের ওপর নেই। বিরোধী দলের উদ্দেশ্যহীন হরতাল কর্মসূচি, জ্বালাও পোড়াও জনগণ গ্রহণ করছে না। বরং বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। জনগণ বুঝতে পারছে তারা শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতায় যাবার বা টিকে থাকার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কারণে তারা আস্থা হারাচ্ছে, রাজনৈতিক দল ও দলীয় নেতাদের ওপর। জনগণের রাজনৈতিক বিমুখতা দেশের সংকট আরো বাড়িয়ে তুলছে।

সাবেক অর্থমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য শাহ এ এম এস কিবরিয়ার নৃশংস হত্যাকান্ডের পর সারা দেশের মানুষ হতচকিত হয়ে পড়ল। শোক বিহ্বল সাধারণ মানুষ বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের বিচার দাবি করে। ফুঁসে ওঠে জনগণ। কিবরিয়া পরিবারের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে শরিক হতে চাইলো জনগণ। কিন্তু পারল না। আওয়ামী লীগ জনগণের এ অনুভূতির গুরুত্ব না দিয়ে ৬০ ঘন্টার হরতালের ডাক দিল। জনগণকে রাস্তায় না নামার সুযোগ দিয়ে জিম্মি করে ফেললো। কিবরিয়া হত্যার পর আওয়ামী লীগ একের পর এক হরতাল ডেকেই চলেছে। হরতালের চিত্র সেই আগের মতোই। রাসেল স্কোয়ারের সংসদ ভবন থেকে কয়েকজন আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য এসে মিছিল করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে যুবলীগের কাঁটাতারে ব্যারিকেটের মধ্যে চলছে মিছিল। মুখ চেনা কয়েকজন যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিছিলের সামনে। মাঝে মাঝে নিস্ফল তাদের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা।

দেশের মানুষ সরকারের ওপর বিরক্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু 'হরতাল'-এর ওপর তার চেয়ে বেশি বিরক্ত, তা যে যে দলই ডাকুক না কেন। আওয়ামী লীগ কোনো অবস্থাতেই সেটা বুঝতে পারছে না, অথবা বুঝতে চাইছে না।

এদেশে হরতাল করা সবচেয়ে সহজ কাজ। প্রধান বিরোধী দলগুলো হরতাল ডাক দিলেই মোটামুটি একটি হরতাল হয়ে যায়।

স্বাধীনতা-উত্তর এদেশে প্রায় ৩ বছর হরতালে অতিবাহিত হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকা।

এদেশের মানুষ এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। জীবনবাজি রেখে রাজপথে থেকেছে। এরশাদ সরকারের পতনের পর প্রথম দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হল। এ নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হল। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বললেন সূক্ষ্ম কারচুপির কথা। শুরু হল সরকার পতনের আন্দোলন। একের পর এক হরতাল। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে আওয়ামী লীগ ৮১ দিন জাতীয় পর্যায় হরতাল পালন করেছে। এসময় প্রায় প্রতি দিনই মিডিয়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া হরতাল বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। হরতাল পালনকারীদের জাতীয় শত্রু বলেছেন। '৯৬ নির্বাচনে দৃশ্যপট পাল্টে যায়। ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। এ নির্বাচন খালেদা জিয়া পুকুর চুরি বলে অভিহিত করে। সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে বিএনপি। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরে বিএনপি ৮৮ দিন জাতীয় পর্যায় হরতাল পালন করেছে। হরতাল সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত করেছে। মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এসেছিলেন প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষণে। তিনি দুই পক্ষের সমঝোতার চেষ্টা করেন। এসময় শেখ হাসিনা বিরোধী দলের উদ্দেশে বললেন, হরতাল দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। বিরোধী দলে গেলে আমরা কখনই হরতাল করবো না। আপনারা হরতাল বন্ধের ওয়াদা দেন। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের মতো বিনিময় সভায় একথা বলেছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে বিএনপি কর্ণপাত করেনি। তারা লাগাতার হরতাল চালিয়ে গেছে। এবার খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এসেছে। আওয়ামী লীগ নেত্রীর ওয়াদা আওয়ামী লীগ ভুলে গেছে। আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই সরকারকে হটিয়ে দেয়ার রাজনীতির খেলা শুরু করে। প্রথমেই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে সংসদ বর্জন করে। পরে শুরু হয় হরতাল। গত তিন বছরে অর্ধ শত দিন হরতাল পালিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, সরকার দলীয়রা হরতাল বিরোধী বক্তব্য দিয়েই চলছেন।

একটি রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় গিয়ে দলীয় আদর্শ বাস্তবায়ন। জনগণের কল্যাণ সাধন। অথচ এদেশের রাজনৈতিক প্রধান দুই দলের মূল লক্ষ্য ক্ষমতায় গিয়ে নিজেদের আখের যোগাড় করা। রাতারাতি ধনী বনে যাওয়া। বিরোধী দলে থাকলে সম্পদের ভাগ বাটোয়ারা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এ কারণে তাদের লক্ষ্য থাকে যে কোনো প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতা যাওয়ার সিঁড়ি হিসাবে তারা কর্মীদের আন্দোলনে মাঠে নামাতে চায়।

এই আন্দোলনে কর্মীর কোনো স্বার্থ নেই। স্বার্থ নেই দেশেরও। স্বার্থ আছে রাজনৈতিক নেতার। একবার ক্ষমতায় যেতে পারলে ফুটপাত থেকে সে হয়ে যায় কোটিপতি। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার সময় তার আশপাশে লোকজন রাতারাতি চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকার গাড়িতে চড়তে শুরু করে। কিন্তু কোনাদিন জানতে চাওয়া হয় না তার এই অর্থের উৎস কী? এখন খালেদা জিয়ার চারপাশে যারা আছেন, তাদেরও একই অবস্থা। এ কারণে এখন যারা ক্ষমতায় আছেন তারা স্থায়ীভাবে থেকে যেতে চান।

পূর্বে ছিলেন এখন নেই তারা যে কোনো উপায়ে ক্ষমতায় যেতে চান। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এই প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়ে অর্থ আয় করা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না।

দেশে স্বৈরাশাসন-উত্তর রাজনীতির গুণগত কোনো উন্নয়ন হয়নি। সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে স্বৈরশাসককে এখন ভালো বলছে নিরুপায় হয়ে। এর জন্য জনগণকে দায়ী করে লাভ নেই। গণতান্ত্রিক দলগুলোর আচরণই স্বৈরশাসকের আচরণের মধ্যে মানুষ আজ তেমন পার্থক্য দেখে না।

আওয়ামী লীগ এদেশের অর্ধ শত বছরের পুরনো রাজনৈতিক দল। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলটি এগিয়েছে। স্বাধীনতা -উত্তর আওয়ামী লীগ '৯৬ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় যায়। ক্ষমতায় গিয়ে দলটি ভুলে যায় তার বিশাল কর্মী বাহিনীকে। নেতারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ভাগ্য ফেরাতে। আঞ্চলিক সন্ত্রাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হাজারী, তাহের, শামীম, দীপু চৌধুরী যারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। দলটি ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ২০০১-এর নির্বাচনে ভরাডুবি হবার পর আওয়ামী লীগকে যেন খুঁজে পাওয়াই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। ক্ষমতায় গিয়ে যেন সে সকল প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেললো। নেতাদের দেশ ত্যাগের চললো হিড়িক। দলীয় ক্যাডাররা রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ত্যাগ করে। এ সময় আওয়ামী লীগের প্রয়োজন ছিল সাংগঠনিকভাবে নিজেদের আবার গুছিয়ে নেয়া। আওয়ামী লীগ তা না করে সরকার পতনের ডাক দিল। আওয়ামী লীগের এখনো বেশ বেহাল অবস্থা। গত তিন বছরে বিশটি জেলায় সম্মেলন করতে পারেনি। প্রতিটি জেলায় চলছে তীব্র কোন্দল। দলের এ অবস্থায় যে শক্তিশালী একটি আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না, তা আওয়ামী লীগের একজন সাধারণ কর্মীও বোঝে। বিষয়টি বোঝেন না শুধু শেখ হাসিনা এবং অন্য নেতারা। আওয়ামী লীগ নেতাদের অবস্থা দেখলে মনে হয় ঈশ্বরের ক্ষমতা পেয়ে গেছেন। দৈব ক্ষমতা দিয়ে তারা সরকারের পতন ঘটাতে চান। সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের '৩০ এপ্রিল' ডেডলাইন তো গত ৩৩ বছরের সেরা কৌতুকে পরিণত হয়েছে। এখনও আবদুল জলিল কথা দিয়ে সরকারের পতন ঘটাতে চাইছে।

সরকার পতনের ৩০ এপ্রিলের ডেডলাইনের আগে দলীয় সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল সারা দেশ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের ঢাকায় সমবেত হবার আহ্বান জানান। কর্মী ও সমর্থকরা ঢাকায় আসেনি। এখন আন্দোলনে আসছে না। কার্যত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে গত ৩ বছরে নতুন কোনো স্বপ্ন তুলে ধরতে পারেনি, যে স্বপ্ন দেখে কর্মী-সমর্থকরা আন্দোলনে যাবে।

দেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই নির্বাচনে চারদলীয় জোটের কাছে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়েছে। সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা আমার জন্যে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই অপেক্ষা করার মতো সময় যেন আওয়ামী লীগের হাতে নেই। সময় নিয়ে, পরিকল্পিত কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হলে নিশ্চয়ই এর সুফল আওয়ামী লীগ পেত। অসংগঠিত, অগোছালো, উদ্দেশ্যহীন 'হরতাল' কর্মসূচি দিয়ে আওয়ামী লীগ নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনছে। এর থেকে এক দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে বিএনপি। হরতালের কারণে সরকারের অনেক ব্যর্থতা চলে যাচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। বারবার ব্যর্থ সরকার পতনের কর্মসূচিতে মনোবল হারিয়ে ফেলছে আওয়ামী লীগের কর্মীরা। কর্মীদের মনে এ ব্যর্থতা যদি স্থায়ী হয়ে যায়, তাহলে আগামী নির্বাচনে যে এর প্রভাব পড়বে না, সেটা জোর দিয়ে বলা যায় না।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী জোট সরকারের নানা ব্যর্থতায় মানুষ অতিষ্ঠ। মানুষ এখন প্রতিবাদ জানাতে চায়। এ কারণে ১৪ দলের ডাকে মানববন্ধনে মানুষ নেমে এসেছিল। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সাধারণ মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হরতালের বিকল্প কর্মসূচি চায়। যে কর্মসূচিতে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে না। ঝুঁকি নিয়ে অফিসে আসতে হবে না। এমন কর্মসূচি আওয়ামী লীগ নিতে পারলে অবশ্যই সাংগঠনিকভাবে লাভবান হবে। এ

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী জোট সরকারের নানা ব্যর্থতায় মানুষ অতিষ্ঠ। মানুষ এখন প্রতিবাদ জানাতে চায়। এ কারণে ১৪ দলের ডাকে মানববন্ধনে মানুষ নেমে এসেছিল। সাধারণ মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হরতালের বিকল্প কর্মসূচি চায়। যে কর্মসূচিতে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে না...

কারণে আওয়ামী লীগের হরতালের কর্মসূচির চেয়ে আসমা কিবরিয়ার নীরব প্রতিবাদের প্রতি মানুষের সমর্থন থাকছে বেশি। অথচ আওয়ামী লীগ আসমা কিবরিয়ার কর্মসূচিকে গতি দেয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে না।

গত তিন বছরে বিএনপি দেশ চালিয়েছে। তারা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় গিয়েছিল। কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতি তারা বাস্তবায়নে আন্তরিকতা দেখায়নি। সন্ত্রাস দমনের জন্য র‍্যাব গঠন করা হয়েছে। র‍্যাব সন্ত্রাসীদের ক্রসফায়ারে হত্যা করছে। এটা বিএনপি তাদের সফলতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিসেবে দেখাচ্ছে।

ক্ষমতায় এসে নিজেদের এবং জামায়াত শিবিরের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা নিতো, তাহলে দেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো না। কারণ জোট সরকার গঠনের পর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা কেউ এলাকা ছেড়ে, কেউ দেশে ছেড়ে পালিয়েছিল। ছিল শুধু বিএনপি-যুবদল-ছাত্রদল আর জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা। আওয়ামী লীগের মতোই বিএনপিও নিজেদের সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীদের রেখেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। দেয়া হয়েছে বিশেষ প্রটেকশন। র‍্যাবের ক্রয়ফায়ারেরও আওয়াতমুক্ত তারা। চট্টগ্রামে জামায়াত সাংসদ শাহাজাহান চৌধুরী তো বিএনপি নিধনে নেমেছে। এতদিন এই অভিযোগ পত্র-পত্রিকা করেছে। এখন বিএনপি নেতারাও এ কথা বলছেন। এমনকি পটিয়ায় বিএনপির রাজনীতি স্থগিত রাখার কথা পর্যন্ত বলছেন স্থানীয় নেতারা।

জোট সরকারের ভেতরের এই টানাপড়েনকে কোনো কাজেই লাগাতে পারছে না আওয়ামী লীগ।

খালেদা জিয়া ক্রসফায়ারের পক্ষে কথা বলছেন। শেখ হাসিনা বলছেন বিপক্ষে। শেখ হাসিনার কথায় যুক্তি বেশি। কারণ তিনি মানবাধিকারের কথা বলছেন। বলছেন বিচার ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করাটা অন্যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোভাব এমন যে, খালেদা জিয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলছেন আর শেখ হাসিনা সন্ত্রাসের পক্ষে কথা বলছেন। অদ্ভুত শোনালেও এটাই বাস্তবতা।

সন্ত্রাসের কাছে বন্দি মানুষের আইন বা মানবাধিকারের কথা শোনার সময় নেই। পিচ্চি হান্নানদের হত্যার খবর তাই তাকে আনন্দিত করছে। তারা ভাবছে, খালেদা জিয়া এবার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়ায় যে সমস্যার সমাধান হয় না সেটা মানুষ এখন ভাবছে না। শেখ হাসিনার এই যৌক্তিক কথাকেও মানুষ যুক্তি দিয়ে ভাবছে না উল্টো বুঝছে। এটা নিয়েও শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের নেতাদের কোনো চিন্তাভাবনা নেই। তারা আছেন হরতাল নিয়ে! অথচ সন্দেহ নেই বর্তমানে দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজমান। বিএনপির নেতা-কর্মীরা ভাবলেশহীন। মন্ত্রীদের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে দেশে কিছুই হয়নি। চারদিকে শুধুই উন্নয়নের জোয়ার। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান ইউনিয়ন পর্যায় দলীয় সম্মেলন করছেন। তাকে ইউনিয়ন নেতারা হাতির মিছিল করে সংবর্ধনা দিচ্ছেন। পায়রার বদলে বন থেকে বিলুপ্তপ্রায় দোয়েল পাখি ধরে এনে উড়ানো হচ্ছে। চারদিকে চলছে সাড়ম্বরে আয়োজন। মন্ত্রীরা উন্নয়নের জোয়ারের বক্তব্য দিলেও, তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মুখ থেকে দেশের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠছে। তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বেশ ক্ষুব্ধ। তারা জানে দলের পরাজয় হলে প্রথমে আঘাত আসবে তাদের ওপর। যেমনটা এসেছিল আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পর তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ওপর। নেতারা পালিয়ে বিদেশ চলে যেতে পারলেও কর্মীরা তা পারবে না। তাদের গ্রামেই থাকতে হবে। খরচসহ আরো কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তারেক জিয়ার এই প্রতিনিধি সম্মেলন বিএনপির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারেক রহমান অন্তত ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের কথা শুনছেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন আওয়ামী লীগ এই কাজটি করেনি। বিরোধী দলে এসেও এই কাজটি করার কথা ভাবেনি। যদিও এই কাজটি আওয়ামী লীগেরই করার কথা ছিল। কারণ গ্রাম পর্যন্ত সংগঠন বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগের অনেক শক্তিশালী ছিল। এখন সেই সংগঠনের অবস্থা খুবই নাজুক অথচ সরকার পতনের জন্যে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন ছিল গ্রাম পর্যায়ে দল গোছানো। এই জায়গাটিতেও আওয়ামী লীগ বিএনপির তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। এসব হতাশাই সম্ভবত আওয়ামী লীগকে হরতালের মতো জনসম্পৃক্ততাহীন কর্মসূচি দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

দেশের বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী দলের সঙ্গে সংলাপে বসার প্রস্তাব দিয়েছেন। জনসভা ও সংসদে তিনি এ প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সংলাপের প্রস্তাব চলমান গণতান্ত্রিক সংকট নিরসনে উত্তরণের পথ হতে পারে। তবে সংলাপের জন্য পরিবেশ তো সরকারি দলের সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু তা তিনি করছেন না। বরং তার দলের নেতাকর্মীদের বক্তব্য আরো বিরোধী শিবিরকে উসকে দিচ্ছে।

ওসমানী উথানের জনসভায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা প্রকাশ্যে গ্রেনেড হামলার দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ওপর। ছাত্রদল বক্তব্য দিয়েছে ৭৫-এর হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেক বার। চলছে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ধরপাকড়। এমন এক পরিস্থিতিতে সংলাপের কথা বলা কি ঠাট্টা করা নয়? সংলাপ করতে

৩২ বছরে সাড়ে তিন বছর হরতাল

স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে প্রথম হরতাল পালিত হয় '৭২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বগুড়ায়। ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপের দুজন নেতার ওপর হামলার প্রতিবাদে পূর্ণদিবস হরতাল হয়। তবে প্রথম জাতীয় হরতাল হয় '৭৩ সালের ২ জানুয়ারি। ১ জানুয়ারি ভিয়েতনাম সংহতি দিবসের মিছিলে ছাত্র ইউনিয়নের দুইজন কর্মী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়ন এ হরতাল আহ্বান করে। স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত ৩২ বছরে দেশ প্রায় সাড়ে তিন বছর হরতালে কেটেছে। পিআইবি ও বিভিন্ন গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

'৭২ থেকে '৭৫-এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ৫টি ও স্থানীয় পর্যায়ে ২২টি হরতাল হয়েছে। '৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরি আইন জারি করা হলে হরতাল ধর্মঘট-নিষিদ্ধ হয়ে যায়। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর ঐ দিন থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকে। '৭৫ থেকে '৮২ পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের সময়কালে জাতীয় পর্যায়ে ৬টি হরতাল হয়েছে। ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ৯টি এবং স্থানীয় পর্যায় ৪৪টি হরতাল হয়েছে। '৮২ সালের ২৪ মার্চ লে. জে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশে যে সামরিক শাসন জারি করেন তা বলবৎ থাকে ৮৬'র ১১ নবেম্বর পর্যন্ত। তার আমলে জারিকৃত বিভিন্ন স্বৈরাচারী বিধি-বিধান সত্ত্বেও '৮২র ২৪ মার্চ থেকে '৯০-এর ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ৭২টি হরতাল পালিত হয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ৫৬ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ২০০টি হরতাল পালিত হয়েছে।

'৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে '৯১-এর ১৯ মার্চ পর্যন্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ পরিচালনা করে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিদায় নেন '৯৬ -এর ৩০ মার্চ। '৯০-এর ৬ ডিসেম্বর থেকে '৯৬ -এর ৩০ মার্চ পর্যন্ত দেশে মোট ৪১৬ দিন হরতাল হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে ৮১ দিন হরতাল হয়েছে। আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলো এ হরতাল ডাকে। '৯৬-এর ৭ জানুয়ারি থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত তত্ত্বধায়ক সরকারের দাবিতে হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়।

'৯৬ সালের ৩০ মার্চ থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিলেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান। এ সময় কোনো হরতাল হয়নি। ২৩ জুন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। '৯৬-এর ৩০ থেকে শুরু করে ২০০০ সালের ২১ জুন পর্যন্ত প্রায় ২৮৭ দিন হরতাল পালিত হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে হরতাল হয়েছে ৬৭ দিন। বাকি হরতাল হয়েছে ঢাকা ও অঞ্চলিক পর্যায়ে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রায় অর্ধশতাধিক দিন জাতীয় পর্যায়েই হরতাল পালিত হয়েছে। দেশে গত ১৫ দিনেই জাতীয় পর্যায় ৭ দিন হরতাল পালিত হয়েছে।

হলে পরিবেশ আগে সৃষ্টি করতে হবে। সরকারি দলের হতে হবে আরো সংযমী। সংসদকে আরো কার্যকর করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। যাতে সংসদে সংলাপ চলতে পারে। কোরামহীন গত সংসদে শুধু সরকারি দল বিরোধী দলকে অকথ্য ভাষায় বক্তব্য দিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলও সরকারের অংশ। তাদের সংসদ কার্যকর করার কোন উদ্যোগ নেই। তারা লাগাতার সংসদ বর্জন করেছে। কিবরিয়া হত্যার পর তারা সংসদে যায়নি। বরং নানা বাহানায় সংসদ বর্জন করার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যেন গঠনমূলক রাজনৈতিক কার্যক্রম ভুলতে বসেছে।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ভরাডুবি হওয়ার পর উচিত ছিল তাদের পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করা। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা। আওয়ামী লীগ তা করেনি। অথচ আওয়ামী লীগ এভাবে হরতাল না করে যদি বিগত ৫ বছরের শাসনামলের তাদের সফলতা জনগণের সামনে তুলে ধরতো, মানুষের বাড়ি বাড়ি যেত, তাহলে আজকে সংগঠনটি চেহারা অন্য রকম থাকতো। বাম দলের ঐক্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের সংগঠনের ওপর ভর করে গঠনমূলক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতো। গত ৫ বছরে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার সঙ্গে সফলতাও ছিল, তাদের সময় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থেকেছে। মুদ্রাস্ফীতি গড়ে ২.৫ ভাগ রয়েছে, যা এখন ৮/৯ শতাংশ। দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে। ৩০ লাখ টন উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন হয়েছে। গঙ্গা পানিচুক্তির মতো অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। '৯৮ সালের বন্যা সফলভাবে মোকাবেলা করেছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এ সফলতার কোনো বক্তব্য দেয় না। তারা জনগণের ভাষাই যেন আজ বুঝতে পারে না। হরতালের সমর্থনে মেঠো বক্তৃতা দেয়াই যেন তাদের কাজ। তারা বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা বলে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দলীয় ভিশন নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত তা আওয়ামী লীগের ভেতর বিন্দুমাত্র নেই। বরং দলীয় কোন্দল রেষারেষি নিয়েই তারা অধিক ব্যস্ত। দলে কে কাকে ঘায়েল করবে।

এখন হরতাল আবারও সহিংস হয়ে উঠছে। বিগত বিএনপি হরতাল ডেকে জনসমর্থন না পেয়ে জনগণের ওপর চড়াও হয়েছে। রিকশা চালকের ওপর পেট্রোল ঢেলে আগুন দেয়া হয়েছে।

এখন আওয়ামী লীগের পিকেটাররাও এ কাজটি করছে। পুড়িয়ে দিচ্ছে গাড়ি। পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীর ওপর কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো। হরতাল

বিএনপির ডাকা হরতালে রিকশা চালকের ওপর পেট্রোল ঢেলে আগুন দেয়া হয়েছে। এখন আওয়ামী লীগের পিকেটাররাও এ কাজটি করছে। পুড়িয়ে দিচ্ছে গাড়ি। পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীর ওপর কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো। মারমুখি পুলিশ। সহিংস রাজনীতির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক খবর...

প্রতিরোধে পুলিশ মারমুখী হয়ে উঠেছে। সহিংস রাজনীতির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক খবর। ধামাচাপা পড়ে গেছে ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা। গ্রেনেড হামলার নেপথ্যের হোতারা সুযোগ পাচ্ছে। সমস্ত ঘটনা পুরো রাজনীতিকীকরণ হওয়ায় তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক না দেশী তদন্ত। এ নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে। অতীতের মতো সরকার পতন ও টিকে থাকার সহিংসতায় কিবরিয়া হত্যার বিচারের দাবি ক্ষীণ হয়ে আসছে। আসমা কিবরিয়া, রেজা কিবরিয়ার আহ্বান ক্রমেই বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

বিরোধী দলের কর্মসূচি মোকাবেলায় প্রথমাবস্থায় সরকার পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করছে। সঙ্গে যোগ দিয়েছে ছাত্রদল ক্যাডাররা। এখন সরকারের মনোভাব আরো কঠোর। বিএনপি রাজপথে থেকে মোকাবেলা করতে চাইছে আওয়ামী লীগকে। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল বিএনপি। পরে একই দিনে হরতালের কর্মসূচিও দিল আওয়ামী লীগ। একই দিনে দুই দলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি নিয়ে শুরু হয়েছে উত্তেজনা। উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে সরকারি দলের দায়িত্ব বেশি। বিরোধী দলের যে একেবারে দায়িত্ব নেই তা নয়। কিন্তু তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

সরকার পতন ঘটাতে হলে বিরোধী দলের আন্দোলন বেগবান করা প্রয়োজন। কিছু সেটা হচ্ছে না। তাই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দিয়ে চেষ্টা চলছে উত্তেজনা সৃষ্টির। আন্দোলনের গতি বাড়ানোর জন্য এখন প্রয়োজন সহিংস ঘটনা। পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে সেটা সম্ভব। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই অগ্রসর হচ্ছে বিরোধীদল। অনড় অবস্থানে থেকে বিরোধী দলকে সাহায্য করছে সরকার।

সরকার মুখে সংলাপ বা সংসদের কথা বললেও সেটা বিশ্বাস করছে না। সরকার বিশ্বাস নিয়ে বলুক সেটা চায় না বিরোধী দলও। ফলে সংলাপ বা সংসদে নয়, যুদ্ধ চলছে এখন রাজপথে। এই অদ্ভুত নিয়তির হাতে বন্দি হয়ে পড়েছে দেশের মানুষ।

আওয়ামী লীগের উচিত ছিল আসমা কিবরিয়ার বক্তব্যেকে সামনে নিয়ে আসা। তার আন্দোলনের প্রতি আন্তরিকভাবে একাত্মতা প্রকাশ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাজাকারের বিচারের দাবিতে ৯৩ সালের দিকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম একাই আন্দোলন শুরু করেছিল। সেই আন্দোলনের প্রতি সর্বস্তরের জনগণ একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। রাজনৈতিক দলগুলোও এগিয়ে এসেছিল। সারা দেশে আন্দোলনের গতি সৃষ্টি হয়েছিল।

সমাজের একজন সফল ভালো মানুষ শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যার বিচার, হত্যাকারীদের মুখোশ উন্মোচিত হোক এটা এ দেশের জনগণ চায়। জনগণ চায় নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ করতে। এভাবে হরতাল চায় না। চায় সংলাপের নামে প্রতারণা। অথচ কিবরিয়ার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে দেশে জোট ও বিরোধী শিবির মুখোমুখি হয়েছে। তারা রাজপথ দখলের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুত হচ্ছে। এমাসের শেষের দিকে রাজপথের রাজনীতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠবে। ঝরবে রক্ত, পড়বে লাশ।